লৌকিক জীবনের অলৌকিক আখ্যান

অঙ্গিরা দত্ত দন্ডপাট

CHARYA PUBLISHERS

Loukik Jebaner Aloukik Akhyan
A collection of horror stories by Angira Datta Dandapat
Published by Charya Publishers
© Angira Datta Dandapat

প্রথম প্রকাশ:
নভেম্বর, ২০২৪

প্রচ্ছদ:
তমোজিৎ দেব

অলংকরণ:
তমোজিৎ দেব

বর্ণ সংস্থাপক:
স্বাগত সিংহ রায়

মুদ্রক:
বসু মুদ্রণ
১৯/এ, সিকদার বাগান স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৪

প্রকাশক:
অঙ্গিরা দত্ত দন্ডপাট
চর্যা পাবলিশার্স
মেদিনীপুর, ৭২১১০১
যোগাযোগ - 6296825371
ই-মেইল - charyapublishers@gmail.com

প্রকাশক বা স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মূল্য : ৩৭০.০০ টাকা

উ ৎ স র্গ

মালিকের পদপ্রান্তে...

ভূমিকা

অ-লৌকিক, শব্দটি কী লৌকিকের বিপরীত? নাকি, লৌকিক জীবনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অসম্ভব কিছু! সাধারণ সরলরৈখিক লৌকিক জীবন পথে হঠাৎ এসে হাজির হয় এমন এক-একটি বাঁক যা স্বাভাবিক বোধবুদ্ধির দ্বারা বিচার করা যায় না, অথচ করা যায় না অস্বীকারও। শুধু হঠাৎ হাজির হওয়া সেই বানের টানে ভেসে যেতে হয়, মেনে নিতে হয় চেনা জগতের বাইরেও সমান্তরালে বয়ে চলেছে এক অ-লৌকিক ধারা, লৌকিক চেনা জীবনের সাক্ষাৎ ব্যতিক্রম।

গাঁ-গঞ্জ-মফঃস্বলের আটপৌরে জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত নিত্যদিনের জীবন, লোকাচার, শোক, আধ্যাত্মিকতা, ইতিহাস, সংস্কৃতির মাঝে ঘটে চলা কিছু অলৌকিক কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে বইটির গল্পগুলি। গল্পগুলিতে উঠে এসেছে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক' বা দেওয়ান গোবিন্দ সিংয়ের 'জাহাজবাড়ি', বা, এক পুরোনো একা অভিশপ্ত মাজার এবং আরও বেশ কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উপাদান, যা ইতিহাস বইতে ক্ষুদ্র হরফে কখনও স্থান পেয়েছে, আবার কখনও পায়নি। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে গাঁ থেকে গাঁয়ে, হারিয়ে গেছে ভাঙা ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে। এই বিষয়গুলো নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে এক-একটি গল্প, তৈরি হয়েছে বই, লৌকিক জীবনের অলৌকিক আখ্যান।

গল্পগুলি লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য এবং লৌকিক তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করেছেন আমার অনুজ সাহিত্যিক রক্তিম মুখার্জি এবং আমার কন্যা অলিশিয়া দন্ডপাট। এই দুজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আন্তরিক ভালোবাসা জানাই।

বইটির গল্পগুলি পাঠকদের ভালো লাগলেই এই প্রয়াস সার্থক হয়।

বিনীত

অঙ্গিরা দত্ত দন্ডপাট

সূচীপত্র

দড়ির খেলা ৯
বীর বাঁকুড়া ২৩
জোড়া কবর ৩৭
আধার ৫১
জাহাজবাড়ি ৫৯
গুহা ৭১
একা মাজার ৮৪
প্রাচীন কৌটো ৯৫

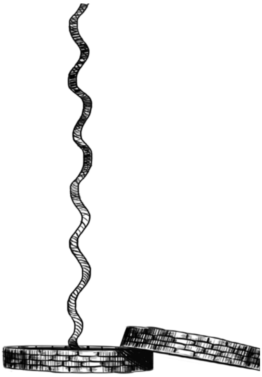

দড়ির খেলা

এক

একটু আগেই মেলার কোলাহল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম শেখরের সঙ্গে। নদীর এই দিকটা নিরিবিলি। ওই দূরে মেলার শেষ সীমানার তাঁবুটা দেখা যাচ্ছে, উঁচু নাগরদোলার চূড়াটাও। শেখরের বাড়িতে আজ পুজো, আমাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরতে চাইছিলো, আমিই বললাম আর কিছুক্ষণ নদীর তীরে বসবো, ঠিক পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারব।

সন্ধ্যা নামার মুখটাতে লাল সিঁদুরে মাখামাখি আকাশ আর মন-খারাপিয়া লালচে-রঙা তিরতির করে বয়ে চলা নদীর জল যেন জল-মাটির পৃথিবীর বাইরের দুনিয়ার এক টুকরো অপার্থিব মুহূর্তের ছবি। রাঙা গোধূলির ফেলে যাওয়া শেষ-বেলার চুঁইয়ে পড়া আলোর পথে সন্ধ্যা-দেবীর আগমনই স্বাভাবিক, প্রতিদিনের। কিন্তু আমার চোখে প্রথমবার রঙের মায়া কাটিয়ে আঁধার নামার প্রতিটি ক্ষণ এই শিলাইয়ের বালুচরেই নজরে পড়ল। হয়তো, জনমানবহীন দুপাশের বালুচরের বুক চিরে তিরতির করে বয়ে চলা একাকী নদী আর নদীর ওই দূরের বাঁক, যেখানে প্রতিদিন দিনমণি শেষবেলায় এক-মুঠো আবির ছড়িয়ে বিদায় নেন, পাড়ের ঘন গাছগাছালির গা বেয়ে নেমে আসা আঁধার— আগে কখনও দেখিনি। প্রথমবার শেখরের সঙ্গে বিকেলে নদীর তীরে বেড়াতে এসে এই দৃশ্য বেঁধে ফেললো আমাকে, কালকের পরে আজও এসেছি বেলা থাকতে

থাকতে শিলাইতে সূর্যডোবা দেখতে। বালুচর, নদীর তিরতির করে বয়ে চলা, চরাচর জোড়া মরা-আলো যেন আমাকে পেয়ে বসেছে, কিছুটা দূরে অস্পষ্ট মেলার কোলাহল।

"বাবুজি, দড়ির খেলা দেখবেন?"

একেবারে কানের সামনে অপরিচিত দেহাতি টানে কথা শুনে চমকে পাশে তাকালাম, কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটু কুঁজো মতো শীর্ণকায় বুড়ো মানুষ। সঙ্গে একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলে। বেশবাস বাজিকরদের মতো, বাঁ-কাঁধে মলিন রঙচঙে ঝোলা। কম আলোতে জরির জ্যাকেটটা বিকট ভাবে জানান দিচ্ছে। ছেলেটির গায়েও ময়লা পাঞ্জাবি, পুরনো জরির জ্যাকেট। হাতে ছোট্ট একটা সাপ রাখার মতো চ্যাপটা ঝাঁপি।

লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "মেলায় খেলা দেখানো হয়ে গেছে ? মেলা কী ভেঙে গেলো?"

লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মেলাতে আর জায়গা হয় না, বহুত দিন খেলা দেখাইনি, দড়ির খেলা দেখবেন বাবু?"

আহা রে, বয়স হয়েছে মানুষটির, মেলাতেও জায়গা হয়নি, আমাকে খেলা দেখিয়ে হয়তো দু-পয়সা রোজগার হবে। আমার নিজেরও এই দড়ির খেলা নিয়ে খুব আগ্রহ। মেলাতে যদিও দেখেছি, কিন্তু মন ভরেনি। বললাম, "নিশ্চয়ই খেলা দেখব, তোমার ঝুড়িতে আবার সাপ-টাপ আছে নাকি?"

লোকটি একটু কাছে এগিয়ে এসে ঝুড়ির ঢাকা অন্য হাতে খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয় ঢাকা-খোলা ঝুড়ি। তাকিয়ে দেখি পাক দিয়ে রাখা মাঝারি মোটা দড়ি রাখা আছে ঝুড়িতে, বুড়ো লোকটি ফিসফিসিয়ে বলে, "জিন্দা দড়ি বাবুজি। হাত দিন, বুঝতে পারবেন।"

গা-টা যেন শিরশিরিয়ে উঠল, হাতটা বাড়াতে গিয়েও সরিয়ে নিলাম। বুড়ো লোকটির মুখের পেশিতে যেন হাসি ফুটল। সে বলল, "বাবুজী, আসমানে দড়ি পাঠাব, ছেলে পাঠাব, বাচ্চা চির-ফোড় হোবে, ছিটকে পড়বে হাত-পা, লড়াই হোবে, জবরদস্ত লড়াই।"

লোকটার গলায় উত্তেজনা, ভালো বাজিকরই বটে, মানুষকে কল্পলোকে নিয়ে যেতে পারে। মেলায় দড়ির খেলা দেখে স্বাদ মেটেনি, কিন্তু এই গোধূলি বেলায় অপস্রিয়মাণ আলোয় দড়ির খেলা বুড়ো বাজিকরের দেখানো অসম্ভব, এই আবছা আলোয় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবে কেমন করে!

সঙ্গের বাচ্চা ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে বুড়োর আর আমার কথা শুনছে, একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করেনি। আমি ছেলেটির দিকে দেখিয়ে অবিশ্বাসের স্বরে বললাম, "এ দড়ির ওপরে উঠবে? ধুর, এখন আর ঐ খেলা কেউ দেখায় না।"

"বাবু, সোচিয়ে মৎ, আমি আপনাকে আসল খেলা দেখাব, দড়ির খেলা।"

দুই

শেখর আমার বন্ধু, একই স্কুলে পড়ায়। মকর সংক্রান্তির নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে শেখরের সঙ্গে ওর গ্রাম পায়রাওড়াতে এসেছি। মিনিট পাঁচ-দশেক হল শেখর বাড়ির দিকে এগিয়েছে।

কলকাতা থেকে ট্রেনে গড়বেতা, স্টেশনেই শেখরের বাবার পাঠানো লোক মোটরসাইকেল নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিল। স্টেশন থেকে কুড়ি কিলোমিটারের মতো ভেতরে পায়রাওড়া গ্রাম। লাল মোরামের পথ, পথের দু'ধারে ধানি-জমিতে ধান কাটা চলছে, দূরে চলছে ধান ঝাড়াই।

শেখরদের বাড়ি যখন পৌঁছলাম সূর্য তখন মাথার ওপরে। বাড়ির সামনে বেশ বড় চাতাল, এক দিকে চার-পাঁচজন মজুর ধান ঝাড়ছে, আর একদিকে ঝাড়াই হওয়া ধানের স্তূপ। তারই পাশে ধূসর-রঙা খড়ও স্তূপ করে রাখা আছে। শহুরে জীবন কাটানো আমার চোখে সবই নতুন, মোটর-সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়লাম ধান-ঝাড়াই দেখতে। শেখর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, "এখন ঘরে চলো, পরে সব ঘুরে দেখাব।"

আপ্যায়নটা বেশ জোরদারই হল। ভেতর-বাড়ির বারান্দাটি যেন রোদে ধুয়ে যাচ্ছে, স্নানের পরে ওখানেই নকশাকাটা আসন পেতে আমাদের দুজনকে কাঁসার থালায় পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে ভাত খেতে বসালেন শেখরের মা। সামনের পাতে ঢেলে দিলেন ঘরে তৈরি ঘি, ম-ম করে উঠল গন্ধে, লেবুর দু-ফোঁটা রস নিংড়ে ভাত ভেঙে শুরু করলাম খাওয়া।

শেখরের মা-বাবা দুজনেই মিশুকে। শেখরের বাবা সম্পন্ন গৃহস্থ; জায়গা-জমি, পুকুর, বাগান নিয়ে বেশ ভালো অবস্থা। কাল সংক্রান্তি, তার আগেই মাঠের সমস্ত ধান যাতে খামারে তোলা হয়, মেসোমশাই তাই আজ ব্যস্ত মজুরদের সঙ্গে। মাসিমা আমাদের পাশে বসে খাওয়ার

তদারকি করতে লাগলেন। মাসিমা কথায় কথায় আমার বাবা-মায়ের কুশল জিজ্ঞেস করলেন, কথার পিঠে কথা চলতে লাগলো। আগে কোনো দিন গ্রামে সে রকম আসিনি শুনে অবাক হলেন, শেখরকে বললেন, "অনিকেতকে বিকেলে নদীটা ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।"

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শিলাই নদী আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে, শিলাই পাড়েই কাল মেলা বসবে, কত লোক মকর-স্নানে যাবে।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই যাব মাসিমা, শেখরের কাছে আপনাদের নদীর গল্প, মেলার গল্প অনেক শুনেছি, এবার সব দেখব।"

মাসিমা হেসে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, মকরের মেলাটা গ্রামের বড়ো আনন্দের, তোমার ভালো লাগবে।"

শেখর মাসিমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "মেলাটা কিন্তু দারুণ হয়, সারাদিন মেলা চলে, বিকেলের মুখে মেলা ভাঙে, কত দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে। মাদারি খেলা, কাটা-মুণ্ডু জোড়া লাগানোর খেলা, দড়ির খেলা — হরেক রকমের খেলা আসে।"

আমি বেশ উৎসাহী হয়ে বললাম, "আমার মাদারির খেলা দারুণ লাগে, এখন তো কলকাতায় আর মাদারির খেলা দেখাই যায় না। দড়ির ওপরে কসরতগুলোও দারুণ লাগে, দড়ির খেলাও আসে বললে?"

শেখর উত্তর দিল, "হ্যাঁ, দড়ির ওপরে কসরত দেখানোর খেলা আসে, কিন্তু দড়ির খেলা বলতে আমি দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক-এর কথা বলছি। ঝুড়িতে রাখা দড়ি বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করে, শেষে আকাশ ছুঁয়ে যায়, সেই খেলা।"

আমি শুনে বেশ অবাক হলাম। এই খেলার কথা বইতে পড়েছি, নেটে অনেক আর্টিকেল পড়েছি, কিন্তু স্বচক্ষে কোন দিন দেখিনি। এই পায়রাওড়াতে বন্ধুর বাড়ি মকর সংক্রান্তির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক' দেখতে পাব, এতোটা ভাবতে পারিনি। আনন্দের সঙ্গে বললাম, "দারুণ ব্যাপার শেখর, এই খেলাটা একটা দুর্ধর্ষ আর্ট, অনেক দিন থেকে দেখার ইচ্ছে।"

কথায় কথায় খাওয়া-দাওয়া প্রায় হয়েই এসেছিল, মাসিমা ডেকে উঠলেন, "বুলা, বুলা রে, দাদাবাবুদের পায়েসটা দিয়ে যা।"

তিন

এক ঘণ্টার মতো বিছানায় গড়িয়েই শেখরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম নদী দেখতে। চাতালে তখনও ধান-ঝাড়াই চলছে, পাঁচ-সাতজন জোয়ান মজুর সমানে খেটে চলেছে, দেখবার মতো কর্মতৎপরতা, আন্তরিকতা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা ধান একত্রিত করে উঁচু উঁচু স্তূপ বানাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। শেখরের গলার স্বরে চমক ভাঙল — "বেলা থাকতে থাকতে চলো নদীর পাড়টা ঘুরে আসি, শীতের বেলা, ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে যাবে।"

বেশ সম্পন্ন গ্রাম পায়রাওড়া, প্রাইমারি স্কুলের পাকার বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে মোরাম বিছানো রাস্তা ধরে কিছুটা যেতেই শিলাই। শীলাবতী নদী, নিচু খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। আমরা উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে। শেখর বলল, "এই উঁচু বাঁধ বরাবরই খানিকটা জায়গা জুড়ে মেলা বসে।"

অদূরেই দেখা যাচ্ছে অস্থায়ী দোকানের তাঁবু বাঁধা হচ্ছে। এক দিনেরই সই, ঘর বাঁধা চাই।

আমি বললাম, "নদীর চরে যাওয়া যায় না?"

শেখর বলল, "হ্যাঁ, চলো, আমরা চরেই যাব।"

ঢালু পথ বেয়ে ব্যালেন্স রেখে সাবধানে নেমে এলাম বালির চরে। সামনেই নদী, দূরে আকাশে লালচে সূর্য, জল যেন শেষ বেলার আলোতে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে, সোনালি থেকে লালচে, ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে রঙ।

শেখর ডানদিকে আঙুল নির্দেশ করে দেখালো, "ঐ দেখো বাঁক, ঠিক ওখানটাতেই সূর্য ডুববে।"

চোখ ভরে দেখলাম আলো মিলিয়ে যাওয়া। আবছা আঁধারে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম বাড়ি।

গরম গরম নারকেল পুরের পাটিসাপটা দিয়ে জলযোগ সেরে গরম চায়ে চুমুক দিলাম। আহা, বাড়ির গরুর দুধের ঘন চা, শেখরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এবার বুঝতে পারছি, কেন তুমি বাড়ি এলে ফেরাটা প্রতিবার একদিন করে পিছিয়ে দাও।"শেখর মুচকি হেসে চায়ে চুমুক দিল।

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে দুই বন্ধুতে এক বিছানায় শুয়েছি, বেশ বড় পালঙ্ক। ঠাণ্ডাটাও বেশ জমিয়ে পড়েছে, লেপের মধ্যে ঢুকে ফোনটা

নিয়ে খুট-খাট করতে করতে শেখরকে বললাম, “কাল তাহলে ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক’ আমায় দেখাচ্ছ মেলাতে।”

শেখর বলল, “ছোটো থেকে দেখে আসছি এই খেলা। মহান নাকি অ-মহান জানি না, তবে এতো জন লোকের সামনে দিনের কটকটে সূর্যের আলোয় ঢাকা দেওয়া ঝুড়ি থেকে বাঁশির শব্দে দড়িটা সোজা বেরিয়ে এসে লম্বা হয়ে ওই এত্তো উঁচুতে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা আমিও বহুবার দেখেছি, এতো জন মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া মুখের কথা!”

আমি ওর কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, “দিনের চড়া রোদে না দেখালে এই খেলা দেখাতেই পারবে না।”

শেখর অবাক হয়ে বলল, “মানে? একদম পরিষ্কার দিনের আলোতে খেলা দেখায়, এই দিনের আলোতেই কারসাজি?”

আমি হেসে বললাম, “দর্শকের চোখে আলো না পড়লে, উঁচুতে দড়ির মুখটা দেখতে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে না গেলে — কেমন করে খেলা দেখাবে বাজিকর? দড়ি বেয়ে বাচ্চাকে ওপরে তুলে ভ্যানিশ করে দেয় না?”

শেখর ঘাড় নেড়ে বলল, “কই না তো!”

আমি বললাম, “ধুর, তাহলে আর কি খেলা দেখায়! খেলার আসল মজা তো ওই বাচ্চা ভ্যানিশে, এই জন্যই তো এই খেলা বিখ্যাত। ইবন বতুতা থেকে শুরু করে হালের শিকাগো ট্রিবিউনের জন উইলি পর্যন্ত ধন্য ধন্য করে গেছে।”

শেখর গল্পের গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে, “বলো কি! এ তো তাহলে বহু পুরনো খেলা, এতো বছর ধরে চলে আসছে? তবে সাদা চামড়ার লোকজনকে এসব খেলার ব্যাপারে ঠিক বিশ্বাস হয় না। ওরা সব আমাদের ভারতবর্ষকে বাঘ, সাপ আর জাদুর দেশ বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। যা দেখত সবেতেই ইয়া বড় হাঁ করে ভিরমি খেতো।”

একটু থেমে বললাম, “শঙ্করাচার্যকে বিশ্বাস হয়? বা শাহেনশাহ জাহাঙ্গীরকে?” প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তাকালাম শেখরের দিকে।

শেখরের অবাক হওয়া তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে বলতে শুরু করলাম, “শাহেনশা জাহাঙ্গীরের আমলে এই খেলা দেখানো হয়েছে মুঘল দরবারে, শঙ্করাচার্যের লেখাতেও এই খেলার কথা উল্লেখ আছে। আগ্রার পথে-ঘাটে ফকির বাজিকরেরা এই দড়ির খেলা দেখাতো মুঘল আমলে। দড়ি বাজিকরের ইশারায় শুধু আকাশই ছুঁতো না, সঙ্গে সঙ্গে আরও

কিছু পরিবর্ধিত অংশ ছিল। মোটামুটি ছোটো বাচ্চা ছেলের ওই সোজা হয়ে দাঁড়ানো দড়ি বেয়ে আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার গল্পটা সর্বত্রই আছে। তবে জন উইলির শিকাগো ট্রিবিউনে লেখা বিবরণটি ওঁর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলেই মনে হয়। আঠেরোশো নব্বইতে পত্রিকায় এই খেলার যে বিবরণ দিয়েছেন পরবর্তীকালে অনেকে দাবি করেছেন সম্ভবত উনি কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওঁর বিবরণ অনুযায়ী, দড়িটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে দড়ির সামনের অংশ দৃষ্টিসীমার বাইরে আকাশে চলে যায়। তখন বাজিকরের সহচর একটি ছোট্ট আট-দশ বছরের ছেলেকে বাজিকর ওই দড়ি বেয়ে ওপরে পাঠায় ওপরের হাল-হকিকত দেখে আসতে। ওপরে ওঠার পরে বাচ্চাটির হাত-পা কাটা হয়ে ছিটকে পড়ে চারদিকে, তখন বাজিকর খোলা তরোয়াল হাতে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে দড়ি বেয়ে লড়াই করতে ওপরে চলে যায়। চিৎকার-চেঁচামেচি দুটো ভিন্ন স্বরে হয় ওপরে, কাউকে দেখা যায় না। এরপর বাজিকর যুদ্ধ জয় করে দড়ি বেয়ে নেমে আসে। আর দড়িটিকে আদেশ করে পুনরায় ঝুড়িতে নেমে আসতে। মুহূর্তের মধ্যে দড়িটি নেতিয়ে নেমে আসে।”

একটু থামতেই শেখর ব্যগ্র হয়ে বলল, “তারপর? বাচ্চাটার কী হতো?”

আমি একটু দম নিয়ে বললাম, “এরপর দেখা যেত বাচ্চাটা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম পারফর্মিং আর্ট খুব কমই আছে, আর এখন তো এই খেলা কোথাও দেখানোও হয় না। ইউটিউবে কিছু লিংক আছে, তুমি যেমন বললে, ওই দড়ির ওপরে ওঠা পর্যন্তই খেলাটা সীমাবদ্ধ। পুরো খেলাটা দেখানোর মতো বাজিকর আর একজনও নেই। তবে আমি সেটুকুও নিজের চোখে দেখিনি, তোমার পুণ্যে সেটা দেখা হবে ভেবেই ভালো লাগছে।”

শেখর বলল, “দু’রকম গলার স্বরের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি, ভেন্ট্রিলোকুইস্ট, আর দিনের বেলায় চড়া রোদে খেলা দেখানোর কারণটাও আন্দাজ করছি, যাতে দর্শকেরা দড়ির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকালেই রোদ চোখে পড়ে ধাঁধা লেগে যায়।” আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, “আর দড়িটার ভেতর ছোটো ছোটো বাঁশের টুকরো সুসজ্জিত থাকে, পরস্পর ইন্টারলকড হলেই শক্ত বাঁশের লাঠি।” শেখর অবাক হয়ে বলল, “এতো কিছু জানতাম না, এ তো বিশাল ব্যাপার! একটা খেলা দেখানোর জন্য এতো আয়োজন!” আমি মুচকি হেসে বললাম, “যখন টিকিট কেটে পি

সি সরকারের ম্যাজিক দেখি আমরা, তখন কি এতোসব ভাবি? আনন্দের জন্যই তো সব আয়োজন, বাজিকরের খেলা দেখানোর আনন্দ, দর্শকের খেলা দেখার। মুঘল বাদশাও যে খেলা দেখেছেন, রাস্তাতে আম আদমিরা বাজিকরের কাছে ওই সময় একই খেলা দেখেছে। আবার সেই খেলাই কাটছাঁট হয়ে গ্রামের মেলায় বছরের পর বছর বাজিকরেরা দেখাচ্ছে। কটা মানুষ আজ এমন মাঠেঘাটে ঘুরে খেলা দেখায়? বেশিরভাগই তো পেশা বদলেছে। কত খেলা বিলুপ্তই হয়ে গেছে।"

কথায় কথায় বেশ রাত গড়িয়েছে, ঘড়িতে প্রায় বারোটা, গ্রামে নিশুতি রাত। ঘুমও পেয়েছে, মনের কোণে বেশ একটা অদ্ভুত আনন্দ হল; রাজা-রাজড়া, বাদশা, উজির যে খেলা দেখেছে, এই শীলাবতী নদীর তীরে গ্রামের মেলাতেও সেই খেলা দেখানো হয়! হোক না কাটছাঁট করে ছোটো করে দেখানো, কিন্তু মূল থিমটা তো একই, সে যুগেও মানুষ দড়ি বেয়ে অদৃশ্য হওয়া দেখে অবাক হতো, আনন্দ পেত, এ যুগেও নেতানো দড়ির আকাশছোঁয়া দেখতে ভিড় জমায়। বাহ রে মানুষের মন, কল্পলোকে অন্তত আকাশে অদৃশ্য হতে চায়!

চার

সকাল থেকেই হইহই কাণ্ড, পিঠেপুলির গন্ধে ঘর ভরে আছে। বাড়ির সবাই ব্যস্ত। মাসিমার আজ নিশ্বাস ফেলার সময় নেই, ঘরদোর নিকানো চলছে, তিনি এত্তো নারকেল কুরুনিতে কুরতে বসেছেন। আজ খামারে লক্ষ্মী পুজো, তারই জোগাড় চলছে সকাল থেকে। লুচির সঙ্গে চাকা চাকা বেগুনভাজা আর ছোলার-ডালসহ জলযোগ সারতে সারতে বেশ বেলা হয়ে গেল। শেখর আমাকে নিয়ে হাঁটা লাগালো মেলার দিকে।

এমন মেলা আমার ধারণায় ছিল না। নদীর বাঁধ বরাবর বেশ খানিকটা জুড়ে বাঁশের ওপর রঙিন কাপড় খাটিয়ে অস্থায়ী দোকান। তবে খোলা আকাশের নীচেও চলছে বিকিকিনি। বঁটি, কাটারি, কোদাল, মাটির হাঁড়ি, কলসি, ঢেলে বিক্রি হচ্ছে। ডুগডুগ-ডুগডুগ করে ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদরের খেলা হচ্ছে, বাঁদরের বিয়ে দেখার জন্য ছেলেপুলেরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বেচারা বাঁদর উলটে-পালটে ডিগবাজি খেয়ে বাঁদরীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা চালাচ্ছে!

তবে সব থেকে ভিড় বেশি চুড়ি, চুলের ফিতে, সাজের জিনিসের

দোকানে, হরেক মাল পাঁচ টাকার দোকানে, আর ঘুগনির ডেকচি ঘিরে। শালপাতায় করে দু-হাতা ঘুগনি, একটু পেঁয়াজ-লঙ্কা কুচি আর টক-জল দিয়ে বিক্রি হচ্ছে, লোকে হুড়োহুড়ি করে কিনছে। সব মিলে বেশ জমজমাট মেলা, ভিড় প্রচুর।

নদীর চরেও আজ বেশ ভিড়, বহু মানুষ স্নান করছেন নদীতে। দুপুরের চড়া রোদে নদীর জল সোনা-রঙা। শেখর আঙুল নির্দেশ করে একটা জটলা দেখিয়ে বলল, "ঐ, ওখানেই দড়ির খেলা দেখায়।"

ভিড় কাটিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম জটলার দিকে।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে দুদিকে দুটো বাঁশের খুঁটি থেকে দড়ি বাঁধা হয়েছে, আর একটি ছোট্ট মেয়ে রঙ-বেরঙের ঝকর-মকর জামা পরে শূন্যে দড়ির ওপর হাঁটছে। খেলা শুরু হয়ে গেছে, আমরা জটলাতে সেঁধিয়ে গেলাম।

দড়ির ওপর বিভিন্ন ব্যালেন্সের খেলা চললো বেশ কিছুক্ষণ, মাথায় মাটির হাঁড়ি নিয়ে, দু-হাতের চেটোয় ছোটো মাটির হাঁড়ি নিয়ে দড়ির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পেরিয়ে গেলো মেয়েটি। সঙ্গে ঢোলে সমান তালে চাঁটি পড়তে লাগলো, আর তার সাথে দেহাতি-হিন্দি-বাংলা মেশানো এক অদ্ভুত ভাষার সংলাপ।

এসব মিটে যাওয়ার পর শুরু হল দড়ির আকাশ ছোঁয়ার খেলা। রিফু করা জরির জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে বাজিকর সাপুড়ে-বাঁশি বাজাতে বাজাতে এলেন একেবারে জটলার কেন্দ্র। এক সহকারী লম্বাটে ধরনের বেতের মুখ ঢাকা ঝুড়ি নিয়ে বাজিকরের পিছু পিছু এসে দাঁড়াল। বাজিকর ঝুড়ি থেকে মোটা প্যাঁচানো দড়ি বের করে ঘুরে ঘুরে সকলকে দেখাতে লাগল দড়ি। হ্যাঁ ওটা দড়িই, সবাই হাতে নিয়ে দেখে বলল সন্দেহ নেই, ওটা দড়িই। সহকারী দড়িটি পেঁচিয়ে ঝুড়িতে রেখে মুখ চাপা দিল ঝুড়িটির। এরপর বাজিকরের কেরামতি শুরু। সাপুড়ের মতো বীণ বাজাতে শুরু করল বাজিকর, কয়েক মিনিট, তারপরেই ঝুড়ি থেকে দড়ি ঠিক সাপের মতো সোজা হয়ে মাথা তুলে নিজের অস্তিত্ব জানান দিলো। হইহই করে উঠল লোকজন, বাজিকরের ভ্রূক্ষেপ নেই, সে বাজিয়ে চললো বীণ, দড়ি ওপরের দিকে উঠতে লাগলো, সকলের দৃষ্টি দড়ির দিকে। আকাশে প্রখর সূর্য, দড়ি উঠতে লাগলো আরও ওপরে, একে বারে আকাশ ছুঁল।

হাততালিতে ফেটে পড়ল মেলার এই ক্ষুদ্র জটলা, দড়ির ওপরের অংশ দেখা যাচ্ছে না, আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে ওপরে।

বাজিকরের বীণ থেমে গেছে, দড়িও স্থির, বাজিকর ওপরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় আদেশ করল দড়িকে নেমে আসার জন্য, এক লহমায় নেতিয়ে পড়ে গেল সেই সোজা দাঁড়িয়ে থাকা দড়ি। আবার হাততালি, আমিও মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিলাম। দলের বাচ্চা মেয়েটি হাতে একটা মাটির মালসা নিয়ে দর্শকদের কাছে ঘুরছে। মালসায় কেউ এক টাকা, কেউ দু'টাকার কয়েন দিচ্ছে। আমার কাছে আসতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট রাখলাম মালসায়, অনেকেই বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালো, শেখরকে বললাম, "চলো, আর ভিড় ভালো লাগছে না। নদীর দিকে যাই।"

শেখরের বাড়িতে আজ লক্ষ্মী-পুজো, মাসিমা বেরোনোর সময় পইপই করে বলেছেন বিকেল-বিকেল যেন বাড়ি ফিরি।

নদীর চরে আজ বেশ ভিড়, এখনও দিন শেষের মিঠে রোদে শীলাবতীর জল চকচক করছে। শেখরের আজ বাড়ির দিকে মন, আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, "চলো, ফিরি, বাড়িতে পুজো।"

কালই আমাদের কলকাতায় ফেরার কথা, এখন নদীর চর ছেড়ে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বললাম, "তুমি এগোও, আমি একটু পরে ফিরছি।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেখর ফিরে গেলো, আর আমি চর বরাবর হাঁটা দিলাম ফাঁকা নিরিবিলির উদ্দেশে।

একটু এগিয়ে যেতেই কমে আসতে লাগল মেলার হই-হট্টগোলের শব্দ, লোকজন এই দিকটায় একদম নেই, যত ভিড় ওই মেলার দিকেই। চুপ করে বসলাম বালিতে, একটু একটু করে রং পালটাচ্ছে; আকাশ, নদী। কালই ফিরে যাব, আজ একটু নদীর তীরে বসি। এমন সময় বুড়ো বাজিকরের মুখোমুখি।

পাঁচ

বুড়ো বাজিকর বেশ বাকপটু, এই কুঁজো শরীরে সে নাকি দড়ি বেয়ে উঠে লড়াই করবে জবরদস্ত! আর এই শেষ-বেলার আবছা আলোয় এই 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক' খেলা দেখানো যায় নাকি! যত পাগলের প্রলাপ!

আমি মশকরা করে বললাম, "আরে, বসো এখানে আরাম করে।

তা, তোমার জীবন্ত দড়ি কিছু কাজ-কাম করে?”

“বাবুজি, এ দড়ি আসমানের সিঁড়ি, তিসরি মঞ্জিলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় এই দড়ি।”

“তিসরি মঞ্জিল? তোমার কল্পনার তারিফ করতে হয়, কল্পনা না থাকলে খেলা সৃষ্টিই বা হবে কী করে! বাহ!”

“গোরাসাহেবরাও বলত, এ মুলুকের বাজিকরদের খেলাতে গল্প লুকিয়ে আছে।”

বুড়ো বাজিকর কিন্তু দাঁড়িয়েই কথা বলছে, কথাবার্তা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু গোরাসাহেব পেলো কোথা থেকে? কোনো উৎসাহী সাহেব হয়তো এসেছিল। বললাম, “বাচ্চাটা খুব শান্ত তো, কথা” মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বুড়ো বাজিকর বলে উঠল, “আমার নাতি, কথা বলতে পারে না জন্ম থেকে।”

আহা রে, মনটা আর্দ্র হয়ে গেলো, যা পারে খেলা দেখাক, ক’টা টাকা দেব বাচ্চাটাকে আলাদা করে। মনে মনে ভেবে আকাশের দিকে তাকালাম, দিনমানের আলো কমে আসছে, আকাশ আবির-রঙা। হাতের ঝাঁপিটা আমার সামনে নদীর দিকে বালিতে রাখল বাজিকর। আরে, এই বুড়ো কি সত্যিই খেলা দেখাবে নাকি! এত কম আলোয় চোখে ধাঁধা লাগাবে কেমন করে? দেখাই যাক কেমন কেরামতি দেখায়।

কাঁধের ঝোলা থেকে আড়বাঁশি বের করে হাতে নিলো বুড়ো বাজিকর। কাঁধের ঝোলা মাটিতে নামিয়ে রেখে আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, “দেখো বাবুজি, আজ জিন্দা দড়ির খেলা দেখো,” বলেই বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সুর তুলল সে।

বহু পুরনো সে সুর, যেন মেঠো পথের আনাচ-কানাচে বহুদিন ধরে ক্লান্ত পথিকের বাঁশিতে এমন সুর ফোটে। খুব পরিচিত, কিন্তু কোথায় শুনেছি কিছুতেই মনে পড়ছে না, কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে লাগলো আমার। বালি থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পায়ে কোনো জোর নেই, উঠতে পারলাম না। বুড়ো বাজিকর একদৃষ্টিতে ঝাঁপির দিকে তাকিয়ে বাজিয়েই চললো বাঁশি, আমারও যেন চোখ আটকে গেলো ঝাঁপিতে। তাকিয়েই রইলাম, কানে বেজে চলেছে একটানা সুরেলা মেঠো সুরের বাঁশি। নড়ে উঠল ঝাঁপি, সরে গেল ঢাকা, আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে লাগলো দড়ি, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো। উঠতে লাগলো ওপরের দিকে, উঁচুতে, আরও উঁচুতে। কম আলোর জন্য পরিষ্কার দেখতে